সারপ্রাইজ

দিলরুবা শাহানা

শব্দ শুনেই চমকে উঠলো দীনা। ঘড়ির দিকে তাকালো। সময় দেখে আন্দাজ করতে চাইল পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে ভেসে এল এই শব্দ। কি বারতা আছে এতে। শংকিত মন নিয়ে টেলিফোনটা কানে ধরলো। অপর প্রান্তে বহুদিন পর ফোনে ভেসে এল বহু চেনা গলা

'ফুপুমনি...'

'তুই এতো রাতে কোথা থেকে?' বক্তাকে বয়ান শেষের সুযোগ না দিয়ে ভীত গলায় প্রশ্ন করলো।

'কেন আমার নিজের ঘরে বিছানায় বসে...'

'যাক এতোদিন পর তোর মন চাইল ফুপুকে ফোন করতে; তা বল কেন ফোন করেছিস'

'কেন ফুপু গত সপ্তাহেইতো দেখা হল তোমার সাথে, তবু কেন কথা শুনাচ্ছ?'

' মাঝেমধ্যে দেখা হলেও কথা হয়না অনেকদিন, তুই নাকি ইউনির ফাঁকে ফাঁকে কাজও করছিস?'

অপারে গলায় হালকা হাসির আভাস

'মা বলেছে বুঝি, মা সারাক্ষণ বিষন্ন চিন্তার মাঝে থাকে, বাইরে গিয়ে বদলোকের পাল্লায় না পারি, আচমকা আজব কান্ড না ঘটাই কখনো, আরও কতকিছু; শুন আমি কিছু করলে বলে কয়েই করবো বুঝলে।'

'বুঝলাম, এখন কেন ফোন করেছিস?'

'কালতো শনিবার তোমারও ছুটি তাইনা, আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে? কাউকে বলা যাবেনা এখন'

'কোথায় কখন?'

'সময় বলতে পারি তবে কোথায় বলবোনা। তোমাকে কিছু বলার আছে।'

সময় ঠিক করে ফোন রেখেও দুঃশ্চিন্তা গেলনা দীনার। মেয়েটি আমুদে। মেয়েটি রহস্যপ্রিয়। মেয়েটি বড় অচেনা হয়ে উঠে কখনো কখনো, আবার কখনো বড় চেনা। কখনো শান্ত, কখনো চঞ্চল। কি বলতে চায় ও। ওর মাকে নিয়ে যত সমস্যা। অতিরিক্ত চিন্তা করে। দীনা ওদের আপন কেউ নয়। তবুও এই বিদেশ বিভুইয়ে অনাত্মীয় আত্মীয় হয়ে উঠে। নিজেকে ওদের আপনজনই মনে হয়। মেয়েটির মাবাবার সাথে ভাইভাবীর সম্পর্ক তৈরী হওয়াতে মেয়েটি ওকে ফুপু বলে ডাকে। বাবা নাই মেয়েটির। বছর চারেক আগে সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। তখন স্কুলে ওর শেষ বছর ছিল। পড়াশুনায় ভাল, বক্তা ভাল। স্কুলে বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা সব কিছুতে ছিল ওর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ। বাবা মেয়েটির খুব বড় উৎসাহদাতা ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর মেয়েটির হৈ হৈ রৈ রৈএর আমুদে স্বভাব হারিয়ে গেল। রহস্যময় কান্ড করে সবাইকে দশ নম্বর মহাবিপদ সংক্ষেতের সময় পার করিয়ে হাসির বন্যায় ভাসানোর কায়দাগুলো ভুলে গেছে। মায়ের সাথে হাসিখুশীতে সময় ওর তেমন কাটেনি। কারন মা কিছুটা গম্ভীর ও প্রায়ই কারনহীন(নাকি কারন কিছু আছে?) আশংকায় আক্রান্ত থাকে।

একবার স্কুলের বিতর্ক দলের নেতা জেইসনকে বাসায় আসতে বলেছিল। মা আশংকাগ্রস্থ হলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা সরাসরি কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। পরে মেয়ের বাপকে দুঃশ্চিন্তা করার মত ঘটনা বলে বর্ননা করলেন। বাবা বললেন এতে অন্যায় কিছুতো নাই। বরং বোঝা যায় ও কাদের সাথে মেলামেশা করে। মার আশংকা তাও গেলনা। উনি কাদের কাছে যেন শুনেছেন বাঙ্গালী কয়েকটি মেয়ে কবে কোথায় কার বুদ্ধিতে যেন মদ চেখেছিল। সেই ঘটনা জানার পর এক মেয়ের মা অসহায় রাগে তিনমাস আপন কন্যার সাথে কথা বলা বন্ধ রাখেন। মায়ের সমস্যা সামলানোর অসহায়ত্বের কারনে ঐ মেয়েটির মাঝে এক অপরাধ বোধ জাগে। শুনা গেছে মেয়েটি নাকি মাকে কষ্ট দেওয়ার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিল। ঘটনা শুনে আমুদপ্রিয় মেয়েটি মাকে আরও অথৈ চিন্তায় ফেলার জন্য হৈ হৈ করে উঠলো

'আরে মদ চাখ্তে ইচ্ছে করলে ঘরে বসে খাবো, বাইরে মাতাল ফাতাল হওয়া খুব ছ্যাচড়ামী ও ভারী জঘন্য ব্যাপার মা, তবে এখন পর্যন্ত আমার মদ চাখ্তে ইচ্ছে হয়নি, হলে বলবো'

মেয়ের কথা শুনে মায়ের আক্কেল গুড়ুম। বাবা সহজ আনন্দে বিস্মিত গলায় বললেন
'দেখেছ আমার মেয়ে কেমন বুদ্ধিমতী! শুন্ মা তোর ইচ্ছে হলে আমাকে বলিস, ভাল আর দামী মদ আনবো আর তার সাথে প্রোপার ওয়াইন গ্লাসও কিনতে হবে, আমাদেরতো সবকিছু নাইও' বলেই মাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিল।
মেয়ের জানার আগ্রহ অনেক তাই ততক্ষনাৎ প্রশ্নও করলো,
'প্রোপার ওয়াইন গ্লাস কোনটা বাপি?'
'ঐ মেয়ে বাপের আস্কারা পেয়ে সর্বনাশা কোন কান্ড না জানি করে বসে!' মায়ের কথাতে থমকে না থেমে বাবা মেয়েকে বিয়ারের গ্লাস, শ্যাম্পেনের গ্লাস ও ওয়াইনের গ্লাস কি রকম তার ইতিবৃত্তান্ত বুঝিয়ে থামলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন
'তুমি হয়তো ভাবছো মদের গ্লাস সম্বন্ধে এতো জানার কি দরকার। এবার শোন কুরবানীর গরু কি রকম হলে ন্যায় সঙ্গত হয় তা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন এক সজ্জন হিন্দু ভদ্রলোক। কম বয়সী বাছুর হবেনা, গর্ভবতী গাভী কুরবানী করা যায়না। উনার কথা শুনে বড় অন্যায়ের হাত থেকে বেঁচে যাই। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের খুব আর্থিক টানাটানি। প্রতিবেশীদের সাথে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য বছরের মত গরুই কোরবানী দেব ভেবে পাঁচমাস বয়সের এক নাদুসনুদুস বাছুর গ্রাম থেকে সস্তায় কিনে আনি। মায়ের আপত্তি না শুনে আমরা দুইভাইয়ে ঐ বাছুরই কুরবানী করবো ঠিক করি। তখন আমাদের হিন্দু শিক্ষক সদানন্দ স্যার কথাগুলো বলেন। তারপর বলেছিলেন প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করার কথা যখন তখন একবছরে বাছুরটিকে পেলেপুষে বড় করে আগামী বছরে ওকে কুরবানী দিয়ে আদরের জিনিস উৎসর্গ করতে পারলে আরও ভাল হবে।' একটু চুপ থেকে মাকে আশ্বস্থ করলেন বাবা
'শুন এই বয়সে যখন এতোটুকু বুঝেছে যে বাইরের লোকের উস্কানিতে মদ খাওয়ার মত কাজ হচ্ছে ছ্যাচড়ামী তখন ওকে নিয়ে চিন্তা একটু কম কর।'
মেয়ে মাকে বললো
'মা, যারা অন্যের মেয়েদের কথা তোমাকে বলেছে, তারাই আবার তোমার মেয়ের নামে কথা বানিয়ে বলে অন্যদের কাছে'
'তোর মা শুনেই সব কথা বিশ্বাস করে ফেলে যাচাই করে দেখার বালাই নাই তার।'
বাবার সাথে বন্ধুর মত সহজ বলে জেইসনকে বাড়ীতে ডেকে আনার কারন খুলে বলেছিল। ওদের বিতর্কের বিষয় ছিল ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একে অন্যেকে মেনে নেয় না অপছন্দ করে। জেইসন ওদের বাড়ী এসে ওর মায়ের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে এমন সুন্দর যুক্তি বিস্তার করেছিল যে ঐ বিতর্কে ওদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারেনি। বাবা সবসময় বলতেন নানা মতের নানা জাতের মানুষের পাশাপাশি বাস করতে হলে অনেক সহনশীল হতে হয়। কথাটার অর্থ তেমন বুঝতোনা। সেদিন মায়ের ব্যবহারে বুঝলো সহনশীলতা কাকে বলে। রসকসহীন মায়ের সামান্য সহনশীলতায় মেয়েটি খুব খুশী হয়েছিল। বাবা বলেছিল
'তুই তোর মাকে বুঝতে চেষ্টা করিস, ওর কিছু কষ্ট আছে যা তোকে বলবো একদিন।'

শনিবার এসে গেল। দীনা সকাল সকালই ওদের বাড়ী চলে এলো। মেয়েটির মা ওকে দেখে খুশী যেমন হলেন একইসাথে অবাকও হলেন।
'তুমি এতো সকালে! আসো তবে নাস্তা খাই একসাথে'
'কেন তুমি জাননা ঐ দুষ্টুটা আমাকে আসতে বলেছে, কোথায় যেন যাবে আমাকে নিয়ে?'
'কোথায়?'
ঠিক ঐ সময়ে পর্দার সরিয়ে মেয়ে হাজির আর হঠাৎ করেই আজ ও যেন আগের মত কল কল করে উঠলো
'বলা যাবেনা, সারপ্রাইজ!'
'সারপ্রাইজ!'

মা ও ফুপু দু'জনেরই বিস্ময়ের উচ্চারণ ঐ শব্দ। যদিও তাদের বিস্ময়ের সাথে শংকাও মিশে ছিল। সারপ্রাইজ শব্দটা চিন্তিত করলো তাদের। তারপরও ফুপু বললো
'এই পাজী মেয়ে তুই আবার কোন ছেলেটেলে পছন্দ করে বসিসনিতো? '
মেয়েটি রহস্যময় এক হাসি মুখে নিয়ে দু'জনকে দেখলো। চা খেতে খেতে ফুপু বললো
'তোর মাকেও নিয়ে যাই, একা ছেলে দেখে আমি মতামত দিতে পারবোনা।'
মেয়েটি ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট চেপে মাথা নাড়িয়ে ফুপুর প্রস্তাব বাতিল করে হেসে বললো
'শোন যদি কোন ছেলেও হয় মা তাকে পছন্দ নাও করতে পারে।' বলে সে কাপড় পাল্টে তৈরী হতে গেল।
এবার মা বললো
'সারপ্রাইজ শুনলেই ভয় লাগে,'
'কেন বলতো?'
দীনার পাল্টা প্রশ্ন
'ঐ যে কোন একমেয়ে মা-বাবার চোখ বেঁধে তাদের সারপ্রাইজ দেবে বলে নিজের ঘরে নিয়ে যায়...'
'হ্যা, বুঝেছি তারপর মা-বাপকে ছুরি মেরে মারতে চায় আর ছুরি খেয়ে মা মারাই যায় তাইতো, এসব আজবচিন্তা বাদ দাওতো।'
কথাবার্তার মাঝে মেয়েটি চলে এল। মাকে বিদায় জানিয়ে ওরা বের হল।

পথে তেমন কথা হলনা। একটি বড় শপিং সেন্টারে যাওয়ার কথা বললো মেয়েটি। দীনা কৌতুক আর শংকা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো
'সত্যি করে বলতো তোর পছন্দের রাজপুত্র কি এখানে আসবে বলেছে?'
মেয়েটি সামনে রাস্তায় চোখ রেখে ঠোঁটে রহস্যের হাসি ফুটিয়ে রাখলো মাত্র। শপিং সেন্টারে পৌঁছে দীনাকে নিয়ে বড় একটা জুয়েলারী শপে ঢুকলো। এবার মেয়েটি ব্যাগ খুলে যত্নের সাথে টিস্যুতে জড়ানো কিছু একটা বের করলো। ডিসপ্লে বাক্সের কাচের উপর টিস্যুর ভাজ খুলে একটি আংটি দীনার কাছে দিয়ে বললো
'এই মাপের একটি হীরার আংটি পছন্দ করতো ফুপু'
'কার জন্য হীরার আংটি?'
'মা'র জন্য' কথাটা যখন বলছিল তখন ওর গলায় কোন রহস্য ছিলনা, চোখে ছিল কোন সুদূরের কষ্ট মাখানো চাহনি।
'হীরার আংটিরতো অনেক দাম হবেরে'
'হউক ফুপু, গত তিনবছরে সামান্য সময়ে কাজ করে আমি ভালই পয়সা জমিয়েছি, দাদীর সখের ইচ্ছা বাবা পূরণ করার সময় পায়নি আজ আমি তা পূর্ণ করতে পারছি।'
ওদের পরিবারের সুখদুঃখের খুটিনাটী দীনা জানতো শুধু এই মেয়ের রহস্য যে কত গভীর তা দীনার জানা ছিলনা। কাজ করে পয়সা কিসে উড়ায় তা নিয়েও মেয়েটির মায়ের চিন্তা ছিল অথৈ। তবে যে সারপ্রাইজ আজ মেয়েটি দিল তা মা ফুপুর কল্পনায়ও ছিলনা।

মেয়েটির বাবা-মা অর্থাৎ হিশাম ও মাহীনের বিয়ের কথাবার্তা যখন সবে শুরু হয়েছে তখন মাহীনের বাবা হঠাৎ করে হৃদপিন্ডের রোগে মারা যান। ওর বাবা হিশাম উৎসব আয়োজনে সময় নষ্ঠ না করে বরিশালের পটুয়াখালীতে গিয়ে নিজের মাকে নিয়ে এসে বিনা আড়ম্বরে বিয়ের কাজ সেরে ফেলেন। বাবাহীন মেয়েকে ছেলের বউ হিসাবে হিশামের মা স্নেহের চোখে দেখলেও ইংরেজী স্কুলে পড়া উচ্চপদস্থের একমাত্র মেয়ের বিষয়ে একটু যেন দূর্ভাবনাও করলেন। তার পটুয়াখালীর টিনের ঘরবাড়ী, জাতাকল ও বাঁশের বেড়ার

গোসলখানার সাথে শহরের ঝকঝকে সবকিছুর তুলনা করে বিশেষ করে মোজাইক বাথরুম দেখে মনে হল এই মেয়ে পটুয়াখালীতে গেলে গোসল করবে কিভাবে। যদিও মাহীন নিতান্ত কম বয়সী তবুও হিশামের বিধবা মা হৃদয় খুলে পুত্রবধুকে ভাইবোনের কি প্রত্যাশা ওদের কাছে তা অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলে গেলেন। বলতে ভুললেন না যে বড়বোনের বিয়ে আগেই হয়েছে। ছোটবোনটার বিয়ে ঠিকই হয়ে আছে শুধু খরচের টাকাটা জোগারের অপেক্ষা মাত্র। আর দুইভাই বছর দুইয়ের মাঝে পড়াশুনা শেষ করে ফেলবে তখন হিশাম ঝাড়া হাতপা। শাশুড়ীর সরলভাষনে মাহীনের মনে খুব দরদ জাগলো। তখনি মনে মনে সে ঠিক করলো নিজের গয়না থেকে পুরো একসেট এখনো না দেখা ননদকে দিয়ে দেবে। শাশুড়ী একসপ্তাহ পর ওদের শহরের ছোট্ট বদ্ধ বাক্সের মত ফ্লাট ছেড়ে পটুয়াখালীর উঠোনপুকুর বিস্তৃত নারকেল, নিম আর সুপারীর বাতাসে দোল খাওয়া খোলামেলা বাড়ীতে ফিরলেন। শীঘ্রি বউকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলে গেলেন।

মাসখানেক পর হিশাম মাহীনকে নিয়ে সদরঘাট থেকে সন্ধ্যার লন্চ ধরলো। কেবিনের সুন্দর ব্যবস্থা। তারমাঝে সবার জন্য টুকটাক উপহার দু'জনে মিলে কিনতে পেরে যাত্রার আনন্দ অনেক বেশী যেন ওদের। মাহীনের মা ওদের জন্য পথের খাবার কাবাব, পরোটা ও সুজির হালুয়া এমন কি বোতলের পানিও দিয়ে দিয়েছেন। উনারা ঢাকার মানুষ। তার স্বামীও ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জের লোক। তার এক ফুফু ছাড়া তিনকুলে আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিলনা। তাই তারা বিদেশ যতো গিয়েছেন ঢাকার বাইরে ততো যাননি কখনোই।

জামাই হিশাম পারিবারিক এক সজ্জন বন্ধুর বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র ছিল। ধনী না হলেও আত্মসম্মানবোধ প্রখর। কলাবাগানে শ্বশুরের বাড়ীতে থাকার বদলে কাছেই ধানমন্ডীতে এক লেখকের বাড়ীর গ্যারাজের উপর ছোট্ট দুইকোঠার বাসাতে উঠেছে। কাছাকাছি একেবারে। লেখকও খুশী। কারন সপ্তাহে একবার হলেও ওরা লেখক ও তার স্ত্রীর কিছু লাগবে কিনা জানতে চায়, খোঁজখবর রাখে। সন্তানেরা কাছাকাছি কেউ নাই বলে হিশাম-মাহীনের উপস্থিতি বাড়ীওয়ালা দম্পতির জন্য যেন এক শক্তি। ভাড়ার চেয়েও ওদের সুব্যবহার ঐ দম্পতির কাছে অনেক মূল্যবান।

লন্চে উঠে মাহীনের আনন্দ আর ধরেনা। কেবিনে ঢুকলো বাধ্য হয়ে যখন জ্যোৎসা মাখা নদীর ঠান্ডা বাতাসে জ্বর এসে গেল প্রায়। ডেকে দাড়িয়ে কত গল্প। কবে হল্যান্ড হয়ে উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে বাবামায়ের সাথে ইংল্যান্ডের ডোভারে পৌঁছেছিল। তবে খোলা ডেকে দাড়াতে পারেনি বাতাস আর সমুদ্রের ঢেউয়ের ভয়ে।

ওরা পটুয়াখালীতে নামতে নামতে সকাল। ততোক্ষণে মাহীনের বেশ জ্বর। পরিকল্পনামত উপহার দেয়ার আনন্দও ঠিকমত উপভোগ করতে পারলোনা। বাড়ীর গেট থেকে বারান্দাতে উঠার মিটার আটদশের লাল ইটের কংক্রীট বিছানো তিনচার ফুটের মত চওড়া পায়ে চলার পথের দু'পাশে সুপারীর গাছের পাতা এপাশেরটা ওপাশের জনকে জড়িয়ে খিলান বা আর্চের মত তৈরী করেছে। যা দেখে মাহীন দারুন মুগ্ধ। শাশুড়ী ওর মুগ্ধতা দেখে বললেন

'বছরে বিশত্রিশ হাজার টাকার সুপারী বিক্রি করতে পারি এতেই ছিল আনন্দ আর আজ আমার শহুরে বউ গাছে ছাওয়া পথটুকু দেখে যে এতো খুশী হল তাতে আমার সুপারী গাছের দাম আরও বেড়ে গেল'।

তবে আনন্দ পূর্নাঙ্গ হলনা ওর অসুস্থতার কারনে। চারদিনের মাঝে একদিনও গোসল করা হয়নি। ফেরার দিনে ননদ খোঁচা দিয়ে বললো,

'আমাদের বাঁশের বেড়ার কলতলা আর জাতাকল দেখেই তোমার ছেলের বউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

কথাটি সামান্য তবে এর অর্থ যে এতো গভীর তা হিশাম বুঝেছিল পরে।

বোনের বিয়ের আয়োজন করতে মাসখনেক পর আবার পটুয়াখালী এসে হিশাম বুঝলো ছোটবোনটি মাহীনকে নানা ভাবে চুলচেরা বিচার করে খুব নাখোশ তার উপর। নানা অভিযোগ। বড়লোক, শহুরে মেয়েরা নাকউচুঁ হয়। গোসল করার ভয়ে জ্বর উঠিয়ে এসেছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে হিশামের মায়ের মৃদু আপত্তি ঝাঁঝের মুখে টিকলোনা। এমনকি আদরের বোনের মনের জটীলতা দেখে হিশাম হতবাক। দু'দিন পর বিয়ে হয়ে চলে যাবে। ওর এখন দরকার স্নেহের বাক্য। ওকেতো এই সময়ে কঠিনকথা বলে ভুল

ভাঙ্গানো কষ্টকর। মাহীনের দেওয়া মূল্যবান জড়োয়ার গয়না পেয়েও মন উঠলোনা বোনের। হিশামের মা ছেলের বউয়ের পাঠানো উপহার দেখে ভেজা চোখে বললেন 'তুই বাবা টাকা পয়সা জড়ো করতে পারলে একদিন ঐ মেয়েকে খুউব দামী হীরার একটা আংটি কিনে দিস আর বলিস ও যেন সবসময় আঙ্গুলে পরে থাকে'। হিশামের বোন বিরক্তি নিয়ে বলেছিল

'যে এতো দামী জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয় তার কাছে হীরার কিইবা মূল্য, তোমার মা বেশী বেশী...।'

হিশাম জানতো মাহীন তার নতুন সেরা গয়নাটিই ননদকে দিয়েছে। বোনের বিয়ের তারিখ পড়লো মাহীনের অনার্স পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে। বিয়েতে আসা হয়নি তার। এ নিয়েও প্রচুর কথা উঠলো।

তারপর পরই মাহীনের মা অসুখে পড়লেন। রোগভোগ দীর্ঘ হল। মাহীনরা ভাড়াবাড়ী ছেড়ে মায়ের বাসায় চলে এল। পর মারাও গেলেন। মাহীন তার একমাত্র মেয়ে সেই তার রোগশোকের সমব্যথী। এম এ পড়াও শেষ হলনা মায়ের দেখাশুনা করতে গিয়ে। এ নিয়েও নানা ধরনের উল্টাপাল্টা অভিযোগে বিপর্যস্থ হল মাহীন। একমাত্র সন্তান হিসাবে অসুস্থ মাকে দেখার দায়িত্ব মাহীনের এই সত্যটা স্বামী ও শাশুড়ীছাড়া আর কেউ মানতে চাইলোনা। কেন সে অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী মাকে ফেলে ননদের বাচ্চার আকিকাতে গেলনা তারজন্যও অভিযুক্ত হল। নিজে যেতে পারবেনা বলে শাশুড়ীর চোখ অপারেশন করাতে ঢাকাতে নিয়ে এসেছিল তাতেও সবাই অখুশী। তখন শাশুড়ী বলেছিলেন 'মা, মানুষের কথায় মন খারাপ করনা, তোমার আর্থিক ক্ষমতা আছে বলেই মাকে চিকিৎসা করাচ্ছো, আমার চোখের অপারেশন করালে। আমার ক্ষমতা থাকলে আমিও হয়তো আমার বাবার চোখ সারিয়ে তুলতাম তাকে অন্ধ হয়ে মরতে হতোনা। মেয়েদের ক্ষমতা বড় কম।'

মাকে দেখভাল করছিল এই তার অপরাধ। মাহীন ছেলে হলে এই প্রশ্ন কেউ তুলতোনা। সবার ধারনা মাবাবাকে দেখবে ছেলেরা মেয়েরা নয়। পরিস্থতির চাপে ধীরে ধীরে বিষন্ন আর চুপচাপ হয়ে গেল মাহীন। ইত্যাদি কারনেও ওরা দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। হিশামও নানা দায়িত্বকর্তব্যের পাকে জড়িত বলে বিদেশে বাস করেও খুব দামী হীরার আংটি আর কিনে উঠতে পারেনি। তবে মেয়েকে হিশাম বলেছিল আরও কিছু টাকা জমলে একদিন ওকে নিয়েই দামী হীরার আংটিটি কিনে আনবে মাহীনের জন্য।